# ক্ষুধিত পাষাণ : সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ?

## বিভূতিভূষণ বিশ্বাস

'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২) গল্পটি কবির মনে প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল যখন তিনি কিছুদিন আমেদাবাদের শাহীবাগের বাদশাহী আমলের পোড়া রাজবাড়িতে ছিলেন। 'ছেলেবেলা'-গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন সতেরো বছর বয়স তখন বিলেত যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে জজীয়তি কর্মে নিযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কিছুদিন ছিলেন। শাহীবাগ ছিল সত্যেন্দ্রনাথের বাসস্থল। সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ নির্জন শাহীবাগে একা ভ্রমণ করতেন। শাহীবাগের অসংখ্য প্রকোষ্ঠে অন্ধকার অলিন্দে ইচ্ছমতন ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্র-মনে হাজার বছর পূর্বেকার অতীতের স্মৃতি,আড়াই শো বছরের পুরাতন শাহীবাগের মধ্যে খুঁজে পেলেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো তখন তিনি গেলেন শাহীবাগ প্রাসাদে আর এখান থেকে গল্পের থিম আয়ত্ত করে আরও সতেরো বছর পরে তা মূর্ত করে তুললেন 'ক্ষুধিত পাষাণে'। দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে মনে মনেই রূপ দিচ্ছিলেন। গল্পটিকে লেখার একবছর আগে ইন্দিরা দেবীকে সাজাদপুর থেকে একখানি পত্রে যা লিখেছেন তা-ই 'ক্ষুধিত পাষাণের' পূর্বসংকেত।—

> "কেন জানিনে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্র-ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, দামাস্ক, সমরকন্দ, বুখারা—আঙ্গুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, সিরাজের মদ, মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগর মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড় পরা দোকানি খরবুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে—পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানালার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাপ বিছানো—জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচাল পরা আমিনা জোবেদি সুফি—পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো কাপড় পরা কালো হাব্‌শী পাহারা দিচ্ছে—এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময়, ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।" (ছিন্নপত্র, সাহাজাদপুর ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)।

সাজাদপুর রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। এর মোহ, এর মায়া—এখানকার বাতাস, সবুজ ডালপালা, পাখির রব, অজস্র ফুলের বিচিত্র গন্ধ কবিকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখত। বিশ্বপ্রকৃতি ও মহাজগতের জন্য কবি-মন এতদিন যে ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার আভাসস্থল পেলেন এখানে। এখানে বসে কবির মনে "কত গল্পের ছাঁচ তৈরি হয়ে ওঠে।"

Scanned with CamScanner

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির শব্দ সংখ্যা প্রায় ৩৭৫০ (সাঁইত্রিশ শ পঞ্চাশ)। গল্পটি প্রকাশিত হয় "সাধনা"-র শ্রাবণ সংখ্যায় ১৩০২-এ। এর কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মতো। গল্পটি 'ফ্যান্টাসি'। এ রোমান্সে ভরপুর। বস্তু ও বিষয়ের দিক দিয়ে রবীন্দ্র গল্পমালায় এর জুড়ি মেলা ভার। গল্পটি যখন লিখেছিলেন তার অল্প কিছুকাল আগে অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ শে জুন কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "বসে বসে সাধনার জন্যে একটি গল্প লিখছি। একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই...।"

রবীন্দ্রনাথ কোন গল্প লিখেছিলেন তার কিন্তু নাম করেন নি। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তিনি 'ক্ষুধিত পাষাণ'ই লিখছিলেন। কারণ "একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প" থেকে বোঝা যায়। আর একটি বিষয়ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—"লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তিবোধ হচ্ছিল"—এর থেকে মনে হয় এই অনিচ্ছাও বিরক্তির কারণ হল কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে তাঁর আসন্ন সাজাদপুর কুঠিবাড়ি পরিত্যাগের বেদনা। এই কুঠিবাড়ি রবীন্দ্রনাথের বড়ই প্রিয় নিকেতন। তাঁর গল্প সৃষ্টির জন্ম হয়েছিল এখান থেকে, আর এ চলেছিল প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর মতো। শাহীবাগ প্রাসাদের পরিবেশ নির্মিত হয়েছে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিতে। এদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনের তৃষিত ক্ষুধার গল্প। নির্জন বরীচের গিরিকুন্ডই, শুস্তা নদীর উপর প্রস্ফুটিত আঁকা বাঁকা পথ, শা-মামুদের ভোগবিলাসের প্রাসাদ, তার স্নানশালা, যুবতী পারসিক রমণীদের স্নানের পূর্বে সেতার বাদন, দাক্ষাবনে গজল গান, দূর থেকে নহবতের আলাপ, নর্তকীর নূপুর নিক্বন—এসবই কবির রোমান্টিক মনের তৃষ্ণার সামগ্রী। কবির রোমান্টিক আতুরতাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে গল্পের নায়িকা। গল্পকথক বলেছে—"সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতল রাজ্যে স্বপ্নের জটিল পথ সঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।"

পাষাণপুরীতে বন্দিনী নায়িকা উষ্ণভেজা কণ্ঠে গল্পের কথককে সানুনয়ে মিনতি করে বলেছে—

> "তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার কর।"

মানস অভিসারে সিক্ত 'ক্ষুধিত পাষাণ'। গল্প রচনার তিন বছর আগে 'সোনার তরীর' 'মানস সুন্দরী' করিতা রচনা করেন। 'মানস সুন্দরীকে' কবি খুঁজে চলেছেন গোধূলি-সন্ধ্যা

Scanned with CamScanner

ও ভোর পথের কনক-দ্যুতিতে সুগন্ধি বসন্ত বায়ুতে, সুপ্ত পূর্ণিমা রাতে অথবা হেমন্তের শেফালি চয়নিকার মাঝে। 'চিত্রা' কাব্যে এসে কবি একেই খুঁজে পেলেন ভিন্ন রূপে—

"অখিল মানস স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।।"

'অনন্তরঙ্গিনী'কে স্বপ্নসঙ্গিনী করে তোলার জন্য কবি হত বা 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' অভিসারে লিপ্ত হয়েছিলেন আর এখানেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?"

রোমান্টিক ভাববেগের ব্যাকুলতা যেন পাড় খুঁজে পেল গল্পের জগতে। 'মানসসুন্দরী'র অভিসারিকা যেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অভিসারের সঙ্গিনী। 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' 'অপরিচিতা', 'বিদেশিনী', 'মধুর হাসিনী'র ডাকে সাড়া দিয়ে কবি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছেন গল্পের মায়াময় জগতে আর তাই কবি যেন বলতে চান—

'করহ পরশ নিকটে আসি'।

গল্পের প্রাকৃতিক পরিবেশের এমন বিস্ময়কর চিত্র রোমান্টিক ভাবাকলুতার এমন সৌন্দর্যময় রূপ কবি কল্পনার সাথে ছোট গল্পকারের এমন দূরগামীতার পরিচয় বাংলা সাহিত্য ভান্ডার তথা বিশ্বসাহিত্য ভান্ডারের বিরল দৃষ্টান্ত।

শুধুমাত্র ছোটগল্পকার রবীন্দ্র-মননের সাথে কবি-মননের সেতুবন্ধন ঘটেনি, ঘটেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতময় জগতেরও। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রগল্পের সম্পর্ক বহুজায়গায় বিস্তারিত ভাবে রয়েছে তবে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-কথন-রীতির গল্পমালাতে। আত্ম-কথন-রীতির গল্প মোটামুটি—

১) 'ঘাটের কথা' (১২৯১)
২) 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১)
৩) 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২)
৪) 'বোষ্টমী' (১৩২১)
৫) 'পরীর পরিচয়' (১৩২৯)—

এ সমস্ত গল্পের গল্পকাহিনীর সুরলিপি আমরা পাই গল্পগুলো প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে লেখা গানে। ১৩০২ সালের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির সুরলিপির তাল মেলে ১৩৩০ সালে রচিত একটি গানে—

"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা বসন্তের এই সঙ্গীতে।
ও কি তার উত্তরীয় অশোকশাখায় উঠল দুলি।
আজি কি পলাশবনে ওই সে বুলায় রঙের তুলি।
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে মল্লিকার ওই ভঙ্গীতে।।
না গো না, দেয় নি ধরা, হাসির ভরা দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে

Scanned with CamScanner

মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়, ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরই রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য-জাগার আসন পাতে —
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথায় রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে।।"

কল্পলোকের অতীত ইতিহাসকে রোমান্টিক চেতনা দিয়ে রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করে কবি তাঁর কলমের স্পর্শে এমন এক অপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পাঠক পর্যন্ত গল্প থেকে এক অনির্বচনীয় ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা লাভ করে। নির্জন প্রাসাদে তরুণী ইরানী ক্রীতদাসীর পিছনে তুলার মাশুল কালেকটর সমস্ত রাত্রি ঘুরে বেড়ায়। সে মাঝে মাঝে মনে করে, কে যেন, "আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে" আবার কখনও বা আর্শিতে "সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া" "পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু তারকায় সুগভীর আবেগ তীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবন পুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে" দর্পণে মিলিয়ে যেত। কখনও বা মধ্যাহ্ন রজনীতে বিছানায় বসে একাকী শুনতে পায়—

> "কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে যেন আমার খাটে নীচে, মেঝের নীচে...কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।"

গল্প-নামেই ভীতিপ্রদ বাসনা রঞ্জিত হয়ে আছে। এক পাষাণপুরী সেখানে কোন এক প্রেত-সত্তা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জীবিত মানুষকে গ্রাস করতে লালায়িত। আফিসের কেরানি করিম খাঁর ভাষায় বলতে পারি—

> "এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখন্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়।"

এই প্রাসাদের জনশ্রুতি সম্পর্কে জানা যায় দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য দেড়শত সোপানময় ঘাটের উপরে শ্বেত প্রস্তরে নির্জন প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। এখানকার স্নানাগারের ফোয়ারাগুলিকে গল্প কথক বলেছেন—

> "কোনো এক সময় তরুণীরা ফোয়ারার মুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত গোলাপগন্ধি জলধারায় স্নান করত, শীকরনিভৃতে গৃহে তারা স্নানের পুর্বে সেতার কোলে নিয়ে দ্রাক্ষাবনে গজল গান করত।"

ইতিহাস আশ্রিত কল্পনা পাঠক মনকে এক ভিন্নধর্মী পরিবেশ জগতে নিয়ে যায়। যেমন—বিজন প্রাসাদের বাদশাহী বিলাস, ইরানী মেয়েদের রূপসৌন্দর্যের কল্পনা, আতরের

Scanned with CamScanner

গন্ধ, নূপুরের নিক্কন, সেতারের ধ্বনি, নহবতের আলাপচারিতা, প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি, সিরাজের মদিরা, কটাক্ষের বিষজ্বালা ইত্যাদি। ইতিহাস আশ্রিত কল্পলোকের গল্পের বক্তা, ফাস্ট ক্লাসের যাত্রী ইংরেজের বন্ধু। গল্পের মধ্যে অবিশ্বাস্য জগৎ জাগতে পারে এই আশঙ্কা করে তিনি শেক্স্‌পীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের বিখ্যাত উক্তিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে বলেন—

> "There happen more thing in heaven and earth, Haratio, tham are reported in your newspapers."

গল্পের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি না হলেও ভৌতিক রস জমে উঠেছে। গল্পের নায়ক পাষাণ পুরীতে তমসাবৃত্ত রজনীতে নেশা জালে জড়িয়ে পড়তো। এই নেশাগ্রস্থ পরিবেশে জড়ানোতেই নায়ক এক বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করত। গল্পে টুকরো টুকরো স্বপ্নময় আবেগে যে শিহরণ জাগায় তাতে ঠিক ভয় নয়, কিন্তু বাদশাহী যুগের অতিক্রান্ত জীবনের কাহিনী নিয়ে এতে সৃষ্টি হয়েছে এক রোমাঞ্চকর ভৌতিক পরিবেশ। ইতিহাসসিদ্ধ বাদশাহী জগতের বিচিত্র আলেখ্য দিয়ে গল্প পটভূমি রচিত হলেও মেহের আলীর উক্তিতে বাস্তব সচেতন পরিবেশকে স্মরণ করে দেয়। বাস্তব সচেতনতার উক্তিটি—

> 'তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।'

দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত তুলার মাসুল কালেক্টরভাবে সে অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, তবে রাতের বেলায় 'শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত' আরেকটি অপূর্ব ব্যক্তি হয়ে উঠতো। আর তাতেই সে অতিপ্রাকৃতের রহস্যপূর্ণ জালে জড়িয়ে পড়তো। এর মিল খুঁজে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের এ উক্তিতে—

> "যখন মনুষ্য হৃদয় কোন উৎকৃষ্টভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থ ও প্রত্যাশীভূত বলিয়া বোধ হয়। 'কপালকুণ্ডলার' সেই অবস্থা।"

বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই অবাস্তবতার সংমিশ্রণে রোমান্টিক কবিদের স্বতন্ত্র ধারনের সাধনা সৃষ্টি হয়েছে। Keats-এর 'La Belle Dame Sans Merci' কবিতা সম্পর্কে কোন এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন—যে মন্তব্যের সঙ্গে 'ক্ষুধিত পাষাণের' সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়—

> "It is a master piece of horror stricken reticence and magical suggestion." (Henford—The Age of Words Worth.)

গল্পের কথক পাষাণপুরীতে রাত্রিযাপনের সময় তার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আড়াই শ বছর আগেকার এক "রহস্যময় ঘেরা শিহরহণ জাগানো অভিজ্ঞতা।" (সময়ের প্রয়োগরীতি—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী) কিন্তু মাশুল কালেক্টরের জীবন তো কেবল রাত্রি নিয়ে নয়—রাতের পরে দিন, দিনের পরে রাত—এই তো চলমান বিশ্বের নিয়ম, আহ্নিক গতির ফলে যেমন দিন রাত্রি ঘুরে ফিরে আসে ঠিক তেমনি গল্পের কথক জীবনে দিনরাত্রি একইভাবে বিদ্যমান। কথক দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত মানুষ সন্ধ্যা নামতেই কথকের মধ্যে আর এক বিশেষ অনুভূতি জাগ্রত হয়। একই ব্যক্তি দুটি ভিন্ন সত্তায় পরিব্যাপ্ত। তাইতো কথক বলেছে—

Scanned with CamScanner

"আমার দিনের সহিত রাতের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং....স্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম .... সন্ধ্যার পর আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম,....।"

মনুষ্য জীবনে দিন ও রাত্রির মতো মাঝে মাঝে বিরোধের সম্ভাবনার জাল সৃষ্টি হয়। ঠিক তেমনি গল্প-কথকেরও। রাতের অন্ধকারে শিহরণ জাগানো বর্ণাঢ্যময় মায়াজালের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে কিন্তু ভোর পথের আলো ফুটতেই পাগল মেহের আলী চিৎকার করে বলেছে—

"সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

ঘূর্ণমান সময় বিন্যাসের বিচিত্র জটিল জালে রবীন্দ্রনাথ গল্পের বিষয়বস্তুকে সংহত রূপে উপস্থাপিত করার মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যে তার প্রকাশ যেন প্রতিপদে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৃষ্টি হয়েছে বাস্তব আর অবাস্তব কল্পলোকের সেতুবন্ধন।

Scanned with CamScanner

# ল্যাবরেটরি : সোহিনীর যজ্ঞবেদী

**অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

নামের মধ্যেই গল্পটির বক্তব্য প্রায় প্রতিষ্ঠিত। কাহিনী সামান্য। কয়েকটি চরিত্র বিশেষ করে প্রধান চরিত্র সোহিনীকে চিত্রিত করার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গল্প। তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে মূল গল্পের শুরু যা সংলাপ সর্বস্ব এবং নাট্যধর্মী।

বৈজ্ঞানিক নন্দকিশোরের ব্রত ছিল বিজ্ঞানচর্চা এবং ছাত্রদের মধ্যে তা 'প্রসারিত করা। এর জন্যে বিদেশের মতো উঁচুমানের ল্যাবরেটরির প্রয়োজন। নন্দকিশোর এই ল্যাবরেটরি গড়ার জন্যেই 'নিষ্কামলোভে' রেলওয়ে কোম্পানির টাকা নির্দ্বিধায় চুরি করেছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পরে তাঁর অনুব্রতা সঙ্গিনী সোহিনী সেই ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে উপযুক্ত ঋত্বিক সন্ধানের কাজে লেগেছে।

প্রথম সাক্ষাতে ঘাঘরা দুলিয়ে বিশবছরের সোহিনী নন্দকিশোরকে বলেছিলো—"অনেক পুরুষকে আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তাহলে তুমি ঠকবে"।

আর নন্দকিশোর, "দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্‌ঝক্ করছে ক্যারেক্টারের তেজ, বোঝা গেল নিজের দাম ও নিজে জানে, তাতে একটু মাত্র সংশয় নেই।"

সোহিনীকে বিচার করতে গেলে দেখা যায়—এই চারিত্র্য শক্তিই সোহিনীর সর্বস্ব। তাঁর নারীত্ব, তার ব্যক্তিত্ব সবই এই শক্তিকে প্রদক্ষিণ করে সব নিন্দাপ্রশংসাকে তুচ্ছ করে দেদীপ্যমান।

নন্দকিশোর পাঞ্জাবের ছত্রির মেয়ে সোহিনীকে যে দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল এবং নিভৃত ছিল না। একথা সে নিজেই বলেছে—"আমি ছিলাম পতিত—উনি আমাকে উদ্ধার করেছেন"। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর সুন্দরী এই মেয়েটি মনে হয় না কোনো সামাজিক পরিস্থিতির যূপকাষ্ঠে অসহায় নিজেকে বলি দিয়েছিলো। সোহিনীর,—"মনে পড়ে প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস।" অন্যত্র, "মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য।" বেহিসাবী যৌবনের প্রমত্ত কামনা ও প্রবৃত্তিরই একান্ত বশ ছিল সোহিনী। মন্দের মাঝে সহজে ও সানন্দে সে ঝাঁপ দিয়েছিল। নন্দাকিশোরের কাছেও সোহিনী এসেছিল প্রেমের টানে নয়। তার সন্তানের জননী-পদ-লাভের জন্যেও নয়। এসেছিল নন্দকিশোরের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের টানে। সে বুঝেছিল যে, নন্দকিশোরের শক্ত ব্যক্তিত্বের জন্যেই তার সুপ্ত ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারবে।

বিদেশ থেকে পাস করা ঝক্‌ঝকে বুদ্ধিদীপ্ত ইঞ্জিনীয়র নন্দকিশোরের যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময় ছিলো না। সর্ববিধ সংস্কার-মুক্ত নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত খাঁটি বৈজ্ঞানিক মনের মানুষ নন্দকিশোর সোহিনীকে এনেছিলেন নন্দকিশোরি করার জন্যে। শাস্ত্রমতে বিয়ে হয়নি বলেই মনে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী বলতে তিনি বুঝতেন যে, স্বামীর ব্রতের সঙ্গে স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিলিয়ে দেবে।

দেখা যাচ্ছে, নন্দকিশোরের সঙ্গে সোহিনীর এক মিত্র-সম্পর্ক ছিলো। প্রেমের টানে কিংবা সংসার গড়ার জন্যে দু'জনে কাছে আসেনি। প্রচলিত নীতিধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই দুজনের সহাবস্থান ছিলো। প্রায় স্বৈরিণী সোহিনীকে নন্দকিশোর মেনে নিয়েছিলেন যোগ্য কর্মসঙ্গিনী হিসাবে। বিদ্যার পরে নন্দকিশোরের নিষ্কাম ভক্তি সোহিনীকে যেমন মুগ্ধ করেছিলো, তেমনি নন্দকিশোর সোহিনীর মধ্যে এমন মূল্য খুঁজে পেয়েছিলেন যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। তাই জীবনের সর্বস্ব যে ল্যাবরেটরি এবং কষ্টার্জিত বিপুল বিত্তের ভার তিনি অকালমৃত্যুর পরে নিশ্চিন্তে সোহিনীর দায়িত্বে রেখে গেলেন। দেহের টানে সামাজিক আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে সোহিনীর বাধে না কিন্তু প্রাণ গেলেও তার শুক্‌নো পাঞ্জাবী মন বেইমানি করতে পারবে না। "যেখানে আমি ছিলেম ছোট সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়িনি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন।" নন্দকিশোরের জীবনব্যাপী সাধনার ধন যে ল্যাবরেটরি, যে কীর্তির মাঝে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হতে চেয়েছিলেন, তার পবিত্রতা ও নিরাপত্তা নিরাপদে রক্ষার জন্যে প্রয়োজনে নারীধর্মের পবিত্রতা বিসর্জন দিতে সোহিনীর কোনো কুণ্ঠা ছিলো না। প্রাণপণে ল্যাবরেটরি রক্ষাতেই সে তার অভিনব সতীধর্ম পালন করেছে। একে কায়মনোবাক্যের সতীত্ব হয়তো বলা যাবে না। তবে নারীব্যক্তিত্বের সতীত্ব বলা যায়।

নীলা নন্দকিশোরের সন্তান নয়। বহুপরিচর্যাকারিণী সোহিনীও তার পিতৃপরিচয় বলেনি। জানা যায়, প্রথম যৌবনে কোনো একজন ওকে প্রবলভাবে টেনেছিলো যার রূপ, বিদ্যা, বংশগৌরব ছিল না কিন্তু যথার্থ পৌরুষ ছিল—যার চুম্বকশক্তি অকথিত কামনার প্রবলটানে মেয়েদের সবকিছু আমূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

নন্দকিশোর ও সোহিনীর মধ্যে সাধারণ দাম্পত্য সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় না। নন্দকিশোরের ছাত্রদের লুব্ধতাও সোহিনী চুটিয়ে উপভোগ করেছে। প্রফেসরকে সে বলেছে, "বলতে ইচ্ছা করে না, নোংরা আমি। দু-চার জনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুড়িয়ে ধরে।" অসংকোচে সোহিনী বলেছে "আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা-সাবিত্রী।" সাজিয়ে তোলা এইসব কৃত্রিমতা থেকে সোহিনী সম্পূর্ণ মুক্ত। এখানেই সে একান্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম। তার ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্যকারী নন্দকিশোরকে সে দিয়েছিলো কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস যেখানে এতোটুকু ফাঁকি ছিলো না। আর ভাবাবেগহীন নন্দকিশোর চিরদিন গুণের মর্যাদাই দিয়েছেন। ল্যাবরেটরির মাতাল, ছোটলোক হেডমিস্ত্রি প্রসঙ্গে নন্দকিশোর বলেছেন—"ওযে গুণী, তার সে গুণ-বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ-খুঁজে মিলবে না"। এর থেকে বোঝা যায়, নীলার জন্মবৃত্তান্ত জানা সত্ত্বেও তিনি কেন সোহিনীকে এতো মান দিয়েছিলেন। সোহিনী প্রফেসরকে বলেছে—"আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনদিন একটু মাত্র নষ্ট করিনি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর কারও কাছে পেতেন না।" সে সস্তা দরের নষ্ট মেয়ে নয়। কলঙ্কের দাগ তার গায়ে লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ ফেলেনি।

Scanned with CamScanner

প্রফেসর চৌধুরী এবং একমাত্র সন্তান নীলাকে সোহিনী নিজের স্বার্থেই ব্যবহার করেছিলো। কিন্তু ঘটনা যতো এগিয়েছে দেখা যায়, প্রফেসর সম্বন্ধে তার যতো স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছে তার থেকেও বেশী করে গড়ে উঠেছে নিখাদ বন্ধুত্ব। স্বামীর সাধনাকে সম্পূর্ণ করার জন্যে ব্রতচারিণী সোহিনী ল্যাবরেটরির যোগ্য ঋত্বিক সন্ধানে প্রথমে প্রফেসারের দ্বারস্থ হয়েছিলো। ধীরে ধীরে সোহিনীর শান্ত মধুর রূপান্তর দেখতে পাই। "দেখুন চৌধুরী মশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যার কাছে অসংকোচে বলতে পারি, আপনি আমার সেই বন্ধু।" অন্যত্র "লোভ নেই আপনার একটুও। আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি"। গল্পের এক বিপজ্জনক বাঁকে সতীর্থের মৃত্যুর জন্যে অধ্যাপককে যখন সাময়িক বিদায় নিতে হচ্ছে, তখন সোহিনীর দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। প্রতিপক্ষের জন্যে যার হাতে ছুরি সহজেই খেলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অবৈধ কিছুতেই যার অরুচি নেই, তার মনও বোধ হয় এই প্রথম উন্মত্ত অভিসার পর্যায় পেরিয়ে শুদ্ধ, শান্ত ভাবসম্মিলনে স্থির হলো। চৌধুরীর গলা জড়িয়ে সোহিনী বলেছে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেকেনা, এও মুহূর্তকালের জন্যে"—বলেই পায়ের কাছে পড়ে সে অধ্যাপককে প্রণাম করেছে।

সোহিনীর মেয়ে নীলা। অসাধারণ সুন্দরী এই মেয়েটির অশান্ত ভরাযৌবন মায়ের কামনা ও প্রবৃত্তির তপ্ত আগুন স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করেছে। দুজনের পার্থক্যের মধ্যে সোহিনীর মননশীলতা, নন্দকিশোরের মতো বৈজ্ঞানিক আশ্রয়ে নিজেকে সুস্থিত করেছিলো, নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানচর্চায় তার চাঞ্চল্য হয়েছিলো স্তিমিত। ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তার ছিল গঠনমূলক প্রাণান্ত চেষ্টা। বায়োলজি ল্যাবরেটরির কানাখোঁড়া কুকুর খরগোসের জন্যে সোহিনী হাসপাতাল বানাতে চায়, মানুষের মতো মানুষ পেলে তার সব পাওনা শোধ করাকেই ধর্মকর্ম বলে মনে করে নাস্তিক সোহিনী। নন্দকিশোরের সঞ্চিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করতে চায় ল্যাবরেটরির উঁচুমানের যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে। তারপর তা দান করতে চায় পাবলিককে। কিন্তু নীলা ভাঙ্গন ধরানো মেয়ে। কলুষিত উদগ্র তার স্বভাব, নির্লজ্জ লালসাভরা তার সংসর্গ যে কালান্তক তার অকালবৈধব্যের মধ্যেও হয়তো তার ইঙ্গিত আছে। ল্যাবরেটরিকে ধ্বংস করার জন্যই যেন সে তার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে কাজে লাগাতে চায়। অসম্ভব তার অর্থের লোভ। ল্যাবরেটরির সঞ্চিত অর্থ লুঠ করার ফন্দিফিকির সে খুঁজে বেড়ায়। মতলববাজ কিছু স্তাবকবৃন্দ তার এই ধ্বংস লীলাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। নীলা যখন দেখে যে, সোহিনী রেবতীকে জামাই না করে সাগ্রহে ট্রাস্টফান্ডের প্রেসিডেন্ট করে দিলো, তখন সে মায়ের অনুপস্থিতে শরীরের ছলাকলায় রেবতীর গবেষণার কাজে বারবার বাধা সৃষ্টি করে। স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী নীলার রেবতীর মতো নিস্তেজ পণ্ডিতের কোন প্রয়োজনই ছিলো না। সে শুধু রেবতীর মাধ্যমে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল, মায়ের কঠিন শাসনে একান্ত বিরূপ হয়ে সংহার লীলায় মেতেছিল।

সুনামের দিক দিয়ে বিতর্কিত জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদে রেবতীকে বসিয়ে মায়ের প্রতিমুখী শক্তি হিসাবে নীলা তার সর্বনাশের খেলা শুরু করল। রেবতী সোহিনী ও অধ্যাপক চৌধুরীর সনির্বন্ধ নিষেধ অমান্য করে গবেষণার কাজে চরম অবহেলা করে নীলার মোহজালে

Scanned with CamScanner

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলো। শুধু তাই নয়, ল্যাবরেটরির ট্রাস্টফাণ্ডের টাকা পর্যন্ত নীলার প্ররোচনায় নয় ছয় করতে লাগল। ঠিক এই সময় আম্বালার কাজ মিটিয়ে সোহিনী উপস্থিত হলো। মা মেয়ের এই নগ্ন নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় সোহিনী জাগানী ক্লাবের গ্রাস থেকে ল্যাবরেটরিকে রক্ষার জন্যে সকলের সামনে নীলার জন্মবৃত্তান্ত উদঘাটন করেছে। সবাই জানালো যে, উত্তরাধিকার সূত্রে নীলা নন্দকিশোরের সম্পত্তির দাবিদার হতে পারে না। এই মর্মান্তিক সংবাদে নীলার টাকার থলির লুব্ধ স্তাবকেরা হতাশায় নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। শেষপর্যন্ত রেবতী নামক অপদার্থের গলায় মালা দেওয়া ছাড়া হয়তো নীলার আর কোনো উপায় থাকতো না। কিন্তু নীলা যেমন সোহিনীর কাছে রেবতীর আসল স্বরূপ দেখিয়ে ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়ে ছিলো তেমনি রেবতীকে এবং নীলাকেও বাঁচালেন পিসিমা।

অল্পবয়সেই সায়ান্সের ডাক্তার পদবিপ্রাপ্ত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র রেবতী সোহিনীর পছন্দের তালিকায় পয়লা নম্বরে ছিলো। কিন্তু অধ্যাপক ওকে ডাকতেন রেবি-বেবি। পিসিমার হাতে মাতৃহীন রেবতীর পৌরুষ ছাতু-হয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপকের ভাষায়, "এক মালাজপকারিনীর হাতে মালার গুটি"। অসামান্য মেধাবী ছাত্র রেবতী ভট্টাচার্যের অসীম সম্ভাবনা ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ভাগ্যাকাশ রাহুর মতো জুড়ে ছিলেন তার পিসিমা। যতোটুকু পরিচয় তার পাওয়া যায় তাতে পৌরুষ বা ব্যক্তিত্বহীন রেবতী পিসিমা ছাড়া হয়তো অন্যকোন নারীর সংস্পর্শেও আসেনি। তাই সোহিনী কিংবা নীলার মতো তীব্র আধুনিকাদের সংস্পর্শে-রেবতী যে একান্ত বেমানান এবং অসহায় বোধ করবে তা বলা বাহুল্য। বিশেষ করে নীলার সম্মোহনী মাদকতা রেঘতীর মতো অনভিজ্ঞের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সোহিনী তাকে ল্যাবরেটরির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিল—যা ছিলো বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করার উপায় এবং একইসঙ্গে নন্দকিশোর ও দেশের সদ্‌গতি। সব প্রলোভন জয় করে বিজ্ঞান সাধনার নিষ্কম্প নিষ্ঠা রক্ষা করতে যে দুরূহ প্রয়াসের প্রয়োজন। রেবতীর মতো সাধারণের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অপাপবিদ্ধ, অবোধ ঋষ্যশৃঙ্গ নারীর ছলনায় আত্মসমর্পণ করেছিল। তাতে তার পৌরুষ ও সাধনা পূর্ণতা লাভ করেছিল কিন্তু এখানে দেখা গেল বিজ্ঞানী রেবতীর পরাভব ও অপমৃত্যু। সোহিনী ফিরে এসে তাকে ল্যাবরেটরি থেকে শুধু বরখাস্তই করেনি—তীব্র শ্লেষে বলেছে।— "এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারিনি—কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম—গোবরের কুণ্ডে আর একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

এই নাটকীয় বিপর্যয় রেবতীর পক্ষে হয়তো শাপে বরও হতে পারে। কারণ সংসারে খাঁটি নীলা অনেক না থাকলেও নকল নীলারও অভাব নেই। তাই পিসিমার আজন্ম পরিচিত নিরাপদ অঞ্চল ছাড়া রেবতী ভট্টাচার্যের জীবনে বারবার বিপদ আসার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

Scanned with CamScanner

# গল্পচর্চা

সম্পাদনা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

Scanned with CamScanner